সংসারের বাজেট মেলাবে কে?

প্রভাষ আমিন

বাংলাদেশে অর্থবছর ধরা হয় জুলাই থেকে জুন, মানে ১ জুলাই শুরু হয় ৩০ জুন শেষ হয়। সাধারণত জুনের শুরুতে অর্থমন্ত্রী সংসদে পরবর্তী বছরের বাজেট প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন। মাসজুড়ে আলোচনা শেষে ৩০ জুন সংসদে বাজেট পাস হয়। এবার বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে ১ জুন, তবে ঈদের ছুটির কারণে চারদিন আগেই ২৬ জুন বাজেট পাস হয়। আয়কর রিটার্ন দাখিল করলেই কমপক্ষে ২ হাজার টাকা কর দেওয়ার প্রস্তাবটি বাদ দেওয়া ছাড়া অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

প্রতি বছরই অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটে একটা 'মশা' থাকে। সামনে দিয়ে উড়ে যাওয়া সেই মশা নিয়ে আমরা সবাই মেতে উঠি, হৈচৈ করি। পেছন দিক দিয়ে হাতি চলে যায় আমরা টের পাই না। আমার ধারণা এটা সরকারের একটা কৌশল। সংসদের ভেতরে বাইরে বাজেট নিয়ে আলোচনায় বারবার ঘুরেফিরে সেই 'মশা' নিয়ে আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত বাজেট পাসের সময় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবনায় সেই মশাটি মারা পড়ে। আর পার পেয়ে যায় সমস্যার হাতি। মশা মারা নিয়ে তখন ধন্য ধন্য রব ওঠে। সবাই বলে, সরকার জনগণের কথা শুনতে পেয়েছে এবং তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে সেই 'মশা' হলো, করযোগ্য আয় থাকুক আর না থাকুক, রিটার্ন জমা দিতে হলে ন্যূনতম ২ হাজার টাকা কর দিতে হবে। করযোগ্য আয় না থাকলেও কর দেওয়ার প্রস্তাবের নৈতিক ও আইনি ভিত্তি নেই। তাই শেষ পর্যন্ত যে এ প্রস্তাব টিকবে না, এটা সবাই জানে। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। এই প্রস্তাবনা টেকেনি। কিন্তু সামনের এই মশা তাড়াতে গিয়ে আমরা পেছনে যে সমস্যার হাতি পার পেয়ে যাচ্ছে সে খেয়ালই করিনি।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে। লাখ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে আমাদের মানে সাধারণ মানুষের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা শুধু শান্তিতে দুই বেলা দুই মুঠো ভাত খেতে চাই। এবারের বাজেটের আগে পরে বাজেট নিয়ে অন্য সব আলোচনা ছাপিয়ে গেছে মূল্যস্ফীতি। কারণ মূল্যস্ফীতির যে উত্তাপ, সেটা সরাসরি আমাদের গায়ে লাগে। সেই উত্তাপের তীব্রতা এখন এতটাই বেশি, আমাদের গা পুড়ে যাওয়ার দশা।

দেশের মূল্যস্ফীতি এখন ১০ ছুঁই ছুঁই, ৯ দশমিক ৯৪। গত ১১ বছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। বাজেট প্রস্তাবনায় অর্থমন্ত্রী মূল্যস্ফীতিকে ৬-এর ঘরে নামিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব, তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। বরং বাজেট ঘোষণার পর মূল্যস্ফীতি আরো বেড়েছে। বাজার পরিস্থিতি আসলে সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে যায় করোনার সময় থেকেই। মানুষের আয় কমে যায়, কিন্তু ব্যয় বাড়তে থাকে হুহু করে। করোনার সময় অনেকের আয় কমে যায়, অনেকে চাকরি হারিয়েছেন, অনেকের ব্যবসায় ধ্বস নেমেছে। এই মানুষগুলো বাজারের পাগলা ঘোড়ার সাথে তাল মেলাতে পারেন না। করোনার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই লাগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা। সেই ধাক্কায় বেসামাল বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ।

নিত্যপণ্যের দাম আকাশ ছুঁয়েছে আগেই। এখন মহাকাশের পানে যাত্রার পালা। বাংলাদেশে একবার কোনো জিনিসের দাম বাড়লে সেটা আর কমে না। নিত্যপণ্যের দাম বাড়লে বিপাকে পড়েন সীমিত আয়ের মানুষ। কিছু ব্যয় থাকে নির্ধারিত। বাসা ভাড়া, সন্তানের পড়াশোনা, চিকিৎসা ব্যয় নির্দিষ্ট। তাই জিনিসের দাম বাড়লে চাহিদা কমিয়ে আনতে হয়। ধীরে ধীরে মাছ, মাংস বা পুষ্টির ওপার চাপ পড়ে। সন্তানের পাতে একটি ডিম তুলে দেওয়া আর সম্ভব হয় না। সপ্তাহে একদিন মাংস খাওয়ার রুটিন মাসে একদিন হয়ে যায়। আস্তে আস্তে হয়তো মাসেও খাওয়া হয় না। মধ্যবিত্তরা কালেভদ্রে রেস্টুরেন্টে যাওয়ার বিলাসিতা ভুলে যান। এভাবে চাহিদা কমাতে কমাতে একদম মৌলিক চাহিদায় চলে আসেন অনেকে। প্রান্তিক মানুষের পেটপুরে খাওয়াও দায় হয়ে যায়।

মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় সরকার সরকারি কর্মচারিদের ৫ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায় ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় ৫ শতাংশ প্রণোদনা কতটা ঢাল হতে পারবে; সেটা বলা মুশকিল। তবে ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের সাথে ৫ শতাংশ প্রণোদনা মিলে সরকারি কর্মচারিরা হয়তো কিছু সামাল দিতে পারবে। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিরাই তো দেশের সব মানুষ নয়। মাত্র ৫ ভাগ মানুষ সরকারি চাকরি করে। সরকারি কর্মচারিদের বেতন বাড়ানো মানে বেসরকারি চাকরিজীবী এবং অন্য মানুষদের অন্যায় প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া। বেসরকারি চাকরিজীবীদের আয় বাড়বে না, ব্যয় বাড়বে। সরকারি চাকরিজীবীরাও পুরো রক্ষা পাবে না। বেতন বাড়ার খবরে বাজারে আরেক দফা জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, তাতে বাড়তি বেতনেও সামলানো মুশকিল হবে। বাজার এখন যেমন উত্তপ্ত হয়ে আছে, তাতে ৫ শতাংশ সরকারি চাকরিজীবীর ৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি তাতে পানির ছিটার মতো মনে হবে। চট করেই মিলিয়ে যাবে। আসলে বেতন বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতির সাথে পাল্লা দেওয়া যাবে না। নির্বাচনের বছরে ৫ শতাংশ প্রণোদনা দিয়ে সরকারি কর্মচারিদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা হয়তো করা যাবে। কিন্তু মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উপায় বের করতে না পারলে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন আরো দুর্বিসহ হবে শুধু।

সরকার খুব গর্বের সাথে নিজেদের ব্যবসাবান্ধব হিসেবে দাবি করে। সরকার নিছক ব্যবসাবান্ধব নয়, ব্যবসায়ীবান্ধবও বটে। তবে এই সরকারকে আর যাই হোক জনবান্ধব বলা যাবে না। বাজারে গেলে তো মনেই হয় না, দেশে কোনো সরকার আছে। বা বাজারের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই মনে হয় না। সরকারও মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। বসে বসে দেখে ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, সিন্ডিকেট ভাঙ্গা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কখনো পেঁয়াজ, কখনো তেল, কখনো আদা, কখনো চিনি; একেক সময় একেকটা পণ্য আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেয়। কদিন আগে কাঁচা মরিচের দাম হাজার টাকা কেজি ছাড়িয়েছে। কাঁচা মরিচ বা আদার দাম বাড়লে হয়তো সাধারণ মানুষের খুব একটা কিছু যায় আসে না। আদা বা কাঁচা মরিচের চাহিদা চাইলেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তবে এটা একটা সূচক। এটা দিয়ে বোঝা যায়, ব্যবসায়ীরা চাইলে যখন তখন মানুষকে জিম্মি করতে পারে। অথচ চাইলেই কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সব পণ্য দরকার নেই; চাল, গম, চিনি, ভোজ্যতেল, ডাল– এই কয়টি পণ্যের ওপর কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করতে পারলেই মানুষ অনেকটা স্বস্তিতে থাকতে পারে। আমাদের কৃষকরা পর্যাপ্ত ধান উৎপাদন করেন। তাই চালের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু সরকারের উদাসীনতায় কৃষকরা যেমন ধান-চালের ন্যায্য মূল্য পান না, আবার ভোক্তাদেরও বাড়তি দামে চাল কিনতে হয়। লাভটা পকেটে যায় মধ্যস্বত্বভোগীর। গম, চিনি, ভোজ্যতেল, ডাল মূলত আমদানিনির্ভর। তবে নিত্যপণ্য আমদানি করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কিন্তু বেশি নয়। সরকার চাইলে আমদানিকারকদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করে, সময় সময় শুল্ক ছাড় দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

আমদানিকারকরা নানা অজুহাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়। কখনো যুদ্ধ, কখনো ডলার সঙ্কট, কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রভাব পড়ে বাজারে। এখানে মজার ব্যাপার ঘটে। আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো পণ্যের দাম বাড়লে সাথে সাথে বাংলাদেশের বাজারে তার প্রভাব পড়ে, দাম বেড়ে যায়। আমদানিকারকরা আগের দামে কেনা পণ্য বাড়তি দামে বিক্রি করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলে বাংলাদেশে দাম কমে না। ব্যবসায়ীরা তখন বলেন, নতুন দামে আমদানি করা পণ্য দেশে আসলে দাম কমবে। ততদিনে আন্তর্জাতিক বাজারে হয়তো আবার দাম বেড়ে যায়। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা আর দাম কমানোর সুযোগ পান না। বাংলাদেশের মানুষ তাই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার ভোগান্তিটা শুধু পান, দাম কমার সুবিধাটা কখনোই পান না।

অর্থমন্ত্রীর লাখ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। অর্থমন্ত্রী যদি দয়া করে আমাদের মধ্যবিত্তের মাসের বাজেটটা একটা মিলিয়ে দেন, তাহলেই আমরা খুশি। ধরুন ঢাকায় যিনি মাসে ৫০ হাজার টাক আয় করেন, তাকে তো আপনি মধ্যবিত্তই বলতে পারেন। চার সদস্যের একটা মধ্যবিত্ত পরিবার থাকার মতো একটা বাসা ভাড়া নিতে গেলে কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা লাগবে। সাথে সার্ভিস চার্জ, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, পত্রিকা, টিভি, ইন্টারনেট, ময়লা, বাসার সহকারীর খরচ মিলে অন্তত ১০ হাজার টাকা লাগবে। বাসে যাতায়াত করলেও মাসে খরচ হবে ৫ হাজার টাকা। সন্তানের পড়াশোনা এবং টুকটাক সাধ-আহ্লাদ মেটাতে ব্যয় হবে আরো ৫ হাজার টাকা। রইলো বাকি ১০ হাজার টাকা। চিকিৎসা, বেড়ানো বাদই দিলাম। এই ১০ হাজার টাকায় চারজন মানুষ সারা মাস কী খাবে? অর্থমন্ত্রী বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে, ব্যাংক থেকে ধার করে ঘাটতি মেটাবেন। সাধারণ মানুষ কিভাবে তার ঘাটতি মেটাবে?